Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : XV Issue : VII, 15th October, 2025. ২৮শে আশ্বিন, ১৪৩২, বার্ষিক মূল্য- ২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

প্রবীণদের সুরক্ষা

শহরের অনেক প্রবীণই এখন একা থাকেন। তাঁদের অনেকেই আর্থিকভাবে সচ্ছল। সন্তানরা সুশিক্ষিত তাঁরা ক্রমে বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠেছেন। প্রবীণদের একা থাকার যন্ত্রণা যত বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাঁদের প্রতি অপরাধীদের কুনজর। গত কয়েক মাসে মহানগরে বারে-বারে আক্রান্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। কখনও শয্যাশায়ী প্রবীণের গলায় ছোড়া ঠেকিয়ে লুট হয়েছে, কোথাও দীর্ঘদিন ছক কষে ফেরিওয়ালা পরিচয়ে বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবা অবশ্যই প্রয়োজন। প্রবীণ নাগরিক যেন, যে কোনও প্রয়োজনে পুলিশকে সহজেই পাশে পান। কিন্তু, পুলিশের উপর যত কাজের চাপ, এবং বাহিনীতে লোকসংখ্যা যেমন অপ্রতুল, তাতে যাবতীয় সদিচ্ছা যোগ করলেও পুলিশের পক্ষে শহরের প্রবীণ নাগরিকদের প্রাত্যহিক দেখভাল করা অসম্ভব।

আমাদের গড়ে তুলতে হবে সচেতন যুবক শ্রেণীকে তারাই পারবে এর প্রতিকার করতে। সেজন্য ক্লাবগুলিকে তারাই পারবে এর প্রতিকার করতে। সেজন্য ক্লাবগুলিকে এই প্রবীণদের স্বার্থে করতে হবে আলোচনা সভা। তার জন্য প্রয়োজন বাড়ি থেকে এর প্রচার। আমরা যদি না হই সচেতন, তবে কী করে গড়ে তোলা সম্ভব এই আগামীর বার্তা। সে কাজটা আমাদের করতেই হবে।

সরকারের কর্তব্য, একটি নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠন করা, যার কাজ হবে এই গোটা ব্যবস্থাটির উপরে নজর রাখা, কোনও তরফে গাফিলতি হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গোটা বিষয়টিকে কিছু জরুরি নিয়মের মধ্যে আনা দরকার। যাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এই প্রবীণদের রক্ষা করার।

প্রত্যেক বছর ১লা অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করা শুধু কর্তব্য নয়। একে যথাযথ যত্নবান করে তুলতে হবে। প্রতিনিয়ত এই প্রবীণদের সুখ-দুঃখের সাথি হয়ে তাঁদের পাশে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিকার করাই হবে আমাদের কর্তব্য।

সবার প্রিয় গৌতম দা

ডঃ গোবিন্দ মাইতি

গৌতম দার অকাল প্রয়াণে আমরা সবাই খুবই মর্মাহত। হঠাৎ চলে যাওয়াটাকে আমরা মন থেকে মেনে নিতে পারছিনা। খুবই বেদনাদায়ক, যেখানে থাকুন তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

দীর্ঘদিন ব্যাঙ্ক পরিষেবায় যুক্ত থেকেও, পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন সংগঠনে নিজেকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রেখেছিলেন। গৌতম বাবুর Bethun Institute-এর প্রতি নিষ্ঠা ও ভালোবাসা কথায় প্রকাশ করা যাবে না। বেথুনের উন্নতির জন্য সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি আরও কিছুদিন সময় পেলে বেথুন অনেকটা এগিয়ে যেতে পারতো, সেটা ভেবে লাভ নেই। এখন আমাদের দায়িত্ব নিয়ে সংস্থার উন্নতি করতে হবে। সবার সহযোগিতা থাকলে যেকোনো সমস্যার সমাধানের একটা রাস্তা বেরিয়ে আসবে।

তিনি লেখক হিসাবে একটা পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের উপর বইটি অনেক তথ্য সমৃদ্ধ। কঠোর পরিশ্রমের ফল। এছাড়াও বেশ কয়েকটা লেখা আমি পড়েছি। প্রবীণ বার্তায় অনেক মূল্যবান লেখাও নিয়মিত প্রকাশ হতো।

নাটকের প্রতি তাঁর ছিলো গভীর ভালোবাসা। একক প্রচেষ্টায় নাটক লেখা ও নিজে পরিচালনার দায়িত্ব ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। বেথুনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালনা করতেন। অবসর জীবনের একদিনও নষ্ট হতে দেননি। নানা সামাজিক কাজে, সাহিত্য চর্চা, সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত্য ব্যস্ত ছিলেন। প্রবীণদের কাছে সেটা একটা শিক্ষার বিষয়। অবসর জীবনেও অনেক মূল্যবান কাজ করা যায়। বিশেষ করে বিভিন্ন সমাজ সেবায় নিজেকে যুক্ত রাখতে পারি। Bethun Institute-এর সাথে অন্যান্য বরিষ্ঠ নাগরিকদের সংগঠনের সাথে সম্পর্ককে দৃঢ় করতে পেরেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় আমরা Help Age India, P. G. Social Res Institute-র সাথে কয়েকটা সফল অনুষ্ঠান করতে পেরেছি। অনুষ্ঠানগুলি প্রবীণদের সমস্যার সমাধানে ও সম্যকজ্ঞান লাভে বিশেষ উপযোগি প্রবীণদের সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়েও কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়েছে। সাহিত্য চর্চা, সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। গৌতম বাবুর কাজগুলো যেন আমরা সমাপ্ত করার চেষ্টা করি। সেটাই হবে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করবে। সবার সহযোগিতায় Bethun Institute আরও প্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে।

স্মরণ-শ্রদ্ধা

পুতুল মৈত্র

আমাদের সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায়চৌধুরী আকস্মিক প্রয়াণে আমরা সবাই মর্মাহত। স্মৃতিচারনায় প্রথমেই বলি- আমাদের সকল সদস্য/সদস্যাদের জীবনের প্রতিটি মূর্হুতে যিনি নিপুন মসৃণতায় ছন্দোবদ্ধ করতে একান্ত চেষ্টা করে গেছেন- সেই সদা প্রাণবন্ত মানুষটিকে চোখের জলের প্রণাম- ভালোবাসা-সম্মান-শ্রদ্ধার্ঘ।

বেথুনে না এলে জানতেই পারতাম না একজন মানুষ কিভাবে একাধারে লেখক-শিল্পী- স্বচ্ছ রাজনীতিবিদ- দক্ষ

সংগঠক- নাট্যকার- পরিচালক- অভিনেতা- সাংস্কৃতিক জগতে নিজের অভিনয় শৈলী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

পুরো পরিবার বামপন্থায় বিশ্বাসী এবং বাম আন্দোলনে যুক্ত। সপরিবারে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকেছেন। অহংকারহীন একজন মানুষ- কলোনীগুলোর হারানো ইতিহাস- অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে জনসমক্ষে আনতে বই প্রকাশ করেছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

গৌতম রায়চৌধুরী এক মৃত্যুহীন প্রাণ।
পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।
আমরা হারালাম একজন সংগঠক-
একজন শিল্পী- একজন সহযোদ্ধাকে।
ঘুরে ফিরে একটাই সুর বাজছে স্মরণ বীনায়
তুমি ছিলে- তুমি আছো- তুমি থাকবে-
গৌতম রায়চৌধুরী দীর্ঘজীবি হোক্।

শেষ করবো- তাঁর প্রিয় তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষে তারই কবিতা দিয়ে–

এসেছে নতুন শিশু,
তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ,
মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব- তবু আজ
যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর
বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি
নবজাতকের কাছে
এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সবাই ভাল থাকবেন- সুস্থ থাকবেন। নমস্কার

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি বেথুনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত গৌতম রায়চৌধুরী মহাশয়কে

রমাপ্রসন্ন দত্ত

আমাদের জীবনের চলার পথে অনেক মানুষের আমরা সঙ্গ লাভ করি। তাঁদের মধ্যে কতিপয় বিরল প্রকৃতির মানুষ আমাদের জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। সেই বিরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন গৌতমবাবু। অসাধারণ মেধা ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা আমাদের সকলের মনে রেখাপাত করেছে। ওনার মধ্যে ছিলো বহুমুখী প্রতিভা ও তার রূপায়ণের জন্য অসীম সাহস ও একাগ্রতা। এমন একজন মানুষকে আমরা বেথুনের বিভিন্ন কর্মের মধ্যে লাভ করে সকল সদস্যরা আনন্দিত ছিলাম।

কিন্তু অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত নেমে এলো, তিনি কর্মরত অবস্থায় আমাদের সকলের মায়ার বাঁধন অতিক্রম করে পরলোকের পথে পাড়ি দিলেন। তিনি যে কর্মযোগ্য শুরু করেছিলেন তাঁর কাজের দায়িত্ব বর্তমান সদস্য বন্ধুদের গ্রহণ করতে হবে। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে বেথুনের সকল সদস্যদের মধ্যে এক শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ওনার কর্মময় জীবনের শান্তি কামনা করি। প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ সদস্য রূপে ওনার পরিবারের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও সকল সদস্যদের আমরা গভীর সমবেদনা জানাই।

ঈশ্বরের নিকট গৌতম বাবুর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শ্রদ্ধেয় গৌতম রায়চৌধুরী

তপন কুমার দাস

হৃদয়ের ভাষায় বলতে হয়, ''পথে এবার নামো সাথি''- ''পথেই হবে এপথ চেনা''। এই পথেই পেয়েছিলাম সত্যসেবী, সমাজসেবী, ও পথপ্রদর্শক গৌতম'দাকে। স্বচেতনায় শানিত একজন ব্যক্তিত্ব। একাধারে সুলেখক, সুবক্তা, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক এবং চিন্তার স্রষ্ঠা। যাঁদের হাত ধরে অনেকটা পথ চলা যায়- তিনি ছিলেন তারমধ্যে অন্যতম। তাঁর কোনো ভাবনা ভাসাভাসা নয়। তাঁর চিন্তাকে সফল করাই ছিলো উদ্দেশ্য। তিনি যেখানে হাত দিয়েছেন, সেখানেই সোনার ফসল ফলিয়েছেন। এই ভাবেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি খুঁজে বেড়াতেন তাঁর চিন্তার মানুষকে। কোনো শুভ কাজই একার পক্ষে সম্ভব নয়- তাই তিনি যৌথ উদ্যোগে বিশ্বাসী ছিলেন। তার পরশে আমাদের সংগঠন নতুন এক দিশার ঠিকানায় উপস্থিত হয়েছে। তিনি সর্বসময় চাইতেন কীভাবে এই সংগঠনকে সমাজের কাজে নিয়োজিত করা যায়। একদিকে স্বাস্থ্য সচেতন শিবির, শরীর পরীক্ষা শিবির, চক্ষু শিবির বা জনহিতকর কাজ, এটাই ছিলো তাঁর কর্ম এবং ধর্ম।

তাঁর সারা বছরের কাজের মধ্যে অন্যতম ছিলো আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস। তিনি যেভাবে পালন করতেন তা আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। কাজের ধারা ছিলো গণিতের মতন। ফলে তাঁর সান্নিধ্য ছিলো, চলার একটি ঠিকানা। যা সংগঠনের পক্ষে সাবলীল।

আর একটি বিষয় না বললে ভুল হবে, বৃদ্ধাবাস ছিলো তাঁর স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য দীর্ঘদিন থেকে তিনি বিভিন্নভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। প্রতি মুহূর্তের সব আলোচনার মধ্যে ভাবনা ছিলো কীভাবে গড়া যায় স্বপ্নের প্রবীণদের বাসভূমি। একটা বিষয়তো বলতেই হবে অর্থ। সেই অর্থ তোলার জন্য যৌথভাবে একটি নামের তালিকা আমরা প্রস্তুত করেছিলাম। যে অর্থ আমাদের ভাবনার ঠিকানা হবে। কাজটি বড় কঠিন, থেমে থাকার সময় কোথায়? অনেকেই বড় আশাবাদী, তার জন্য চাই শ্রম, নিষ্ঠা, নবতর উদ্যোগ এবং সততা। একাজ আমাদের করতেই হবে।

তিনি কখনো স্বপ্নের আলোকে না থেকে বাস্তবের অলিন্দে চলাফেরা করতেন। চাই অনেকের সাহায্য ও ভালোবাসা, চাই প্রত্যেকের এগিয়ে এসে, গৌতম'দার ভাবনাকে মর্য্যাদা দেওয়া ও সাবলীল করে গড়ে তোলা। তাঁর যাপন ছিলো, লালন ছিলো, পালন ছিলো সংগঠনকে মজবুত করা- এই শিক্ষা হোক আমাদের ব্রত এবং আগামীর জারমানদের ভবিষ্যৎ।

শ্রদ্ধেয় গৌতম রায়চৌধুরী জীবনালেখ্য

স্নেহাংশু চাকদার

পিতা-ঁঅজিত নাথ রায়চৌধুরী ও মাতা-ঁআভা রাণী রায়চৌধুরী।

জন্ম- ০১ এপ্রিল ১৯৫১, অধুনালুপ্ত- লেক হাসপাতাল, কোলকাতা তাঁর পিতৃপুরুষের আদি বাসস্থান ছিলো অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার উলপুর।

শৈশব কেটেছে এখানকার চেতলায়। ১৯৫৭ সালে তাঁরা কাটজুনগরে বসবাস শুরু করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন যাদবপুর হাইস্কুল থেকে। তারপর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গোয়েঙ্কা কলেজ অব কর্মাস-এ পড়াশুনা করে স্নাতক এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

সমগ্র কর্মজীবন এক রাষ্ট্রয়াত্ব ব্যাঙ্কে কাটিয়ে ২০১১ সালে শীর্ষ আধিকারিক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি সাহিত্য অনুরাগী এবং নাট্য প্রেমিক। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অশ্বোপাখ্যান এবং আরও এক, কাটজুনগর ইতিহাসের সন্ধানে, আমাদের বিদ্যাসাগর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য যা সুধী সমাজে এক বিশেষ সমাদর পেয়েছে।

তিনি স্বরচিত নাটক ও শ্রুতি নাটক মঞ্চস্থ করতেন। তাঁদের পারিবারিক পত্রিকা অর্হন প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি উদ্যোগী ছিলেন। উলপুর সমিতির বার্ষিক দূর্গাপুজোর তিনি অন্যতম সংগঠক ছিলেন। কাটজুনগর জাগৃতি সংঘের লাইব্রেরীর উন্নয়ণে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

ব্যাংকের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর ১২ অগাস্ট ২০১১ তারিখে বেথুনের সদস্য হন। পরবর্তীতে তিনি বেথুনের সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময়কালে সংস্থার উন্নতিকল্পে নানা ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

৮ জানুয়ারী ২০১৫ জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ ভবণে ডাঃ নর্মাণ বেথুন ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সেখানে ফিজিও থেরাপী-সহ অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ উক্ত ক্লিনিকে বকুল দত্ত মেমোরিয়াল আকুপাংচার ইউনিট স্থাপন করা হয়। গৌতম'দার নেতৃত্বেই উপরোক্ত কর্মসূচীসমূহ সংগঠিত করা হয়েছে। এই কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়ন করতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

১ জুন ২০১৭ সালে এক চুক্তির মাধ্যমে-

ক্লিনিক স্থাপনের জন্য জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ ভবনের নিচতলায় ১৪৮২ Sq ft. এবং প্রথমে তলায় ৬৫৮ Sq ft. জায়গা বেথুনের পক্ষ থেকে ৯০০ বছরের লিজে নেওয়া হয়েছে। এই লিজ নেওয়ার জন্য বেথুনের পক্ষ থেকে টাকা ৩৯,৬৯,৬০৫/-প্রদান করতে হয়েছে। ঐ সময় কো-অপারেটিভ ভবনে বৃদ্ধাবাস স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিলো। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে সেটা করা হয়ে উঠেনি। এই সমস্ত খরচের টাকা গৌতম দার নেতৃত্বে আমরা সংগ্রহ করেছি। ৩ জুন ২০২৩ বার্ষিক সাধারণ সভায় গৌতম'দাকে সম্পাদক পদে মনোনিত করা হয়।

সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সংস্থার কাজ সম্প্রসারণের লক্ষে আরও নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হন। K.M.C-এর সাথে Tax সংক্রান্ত সমস্যা গৌতম'দার নেতৃত্বেই সমাধান করা হয়েছে।

একটি জিনিস আমার মনে ভীষণভাবে রেখাপাত করেছে, তা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরলাম। তিনি বেথুনের সদস্য হয়েছে ১২/০৮/২০১১ তারিখে এবং

প্রয়াত হয়েছেন ১২/০৮/২০২৫ তারিখে।

বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার-এর তিনি ছিলেন অন্যতম প্রাণপুরুষ। সকলকে সমবেত করে সংগঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এছাড়া সংগঠনের যে কোনো সমস্যা সমাধানে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের মাসিক মুখপত্র 'প্রবীণবার্তা'র উন্নয়ণে তিনি যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সব সময় জয় ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করতেন। জয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সুদূর প্রসারী চিন্তাধারার প্রশংসা করে তিনি বলতেন, তারা পূর্ব থেকেই বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই প্রবীণ ব্যক্তিদের কথা ভেবে শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে এলাকার গণ্যমান্য লোকদের সাথে নিয়ে বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলতেন, তাদের স্বপ্ন এবং লক্ষ্য পুরণে আমাদের সমবেত প্রচেষ্ঠা অব্যহত রাখতে হবে।

তিনি Joy Industrial Co-Operative Society Ltd-এর সম্পাদক ছিলেন। প্রতিকূল অবস্থা থেকে কিভাবে সংস্থাকে সঞ্জীবিত করা যায় সে বিষয়ে নিরলস চেষ্টা তিনি করে গেছেন। নর্মান বেথুন ট্রাস্ট-এর তিনি ছিলেন Managing Trustee.

রায়নগর, বাঁশদ্রোণীতে জয় ইউনিয়নের ৩ কাঠার উপর জমি আছে। সেখানে স্বল্প আয়ের বয়স্ক লোকদের থাকার জন্য বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো।

বেথুন ইন্সটিটিউট ও জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য আমারা তাঁর নেতৃত্বে যে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম তা বাস্তবায়নের লক্ষে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

বিদ্যাসাগর ও মানবাধিকার

গৌতম রায়চৌধুরী

'আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ব গুণে দেশাচারের দূর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন।' (১)

রবীন্দ্রনাথ যাকে পৌরুষ বলেছেন, সবাই 'তিরস্করণী' (দয়া-দাক্ষিণ্য)-এর দ্বারা যাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, বিনয় ঘোষ তাকে 'মানবচেতনা' বলে অভিহিত করেছেন।

'... দয়াদক্ষিণ্য বদান্যতা মহানুভবতা মাতৃভক্তি সব কটি মানবচরিত্রের মহৎ গুণ হলেও, ব্যক্তিচরিত্রের উপাদান হিসেবে তার বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। ... কেবল এই গুণগুলির সমাবেশের জন্য বিদ্যাসাগরের মতো ঐতিহাসিক চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয়নি। তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ হলো এই হিউম্যানিজম, এই মানবতন্ময়তা, এই মানবাচ্ছন্ন চেতনা। মানব-অতীত ও মানব-ব্যতীত সমস্ত চেতনার উপরে ছিল তাঁর মানবচেতনা। এই চেতনাই ঐতিহাসিক।' (২)

মানুষের ইতিহাসে আদি-অনন্তকাল থেকেই এই চেতনা সুপ্ত ছিলো। হয়তো তখন বৈষম্য সমাজে সর্বব্যপী না হওয়ার কারণে ঘুম ভাঙ্গেনি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে

পাল্লা দিয়ে বৈষম্যেরও বিস্তার ঘটলো। পনেরো-ষোল শতকের ইতালি, বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে এই দ্বন্দটা প্রকট হলো এবং মানবচেতনার লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট হলো। ইতিহাসে যা নবজাগরণ বা রেনেসাঁস বলে খ্যাত।

এই দু'তিনশো বছর পর উনিশ শতকে ইংরেজদের হাত ধরে বাংলায় রেনেসাঁসের লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে। ইতালির যেমন ফ্লোরেন্স, ভারতে তেমনি কোলকাতা হলো এর ধাত্রভূমি। ধারক রামমোহন হয়ে বিদ্যাসাগর, পরে রবীন্দ্রনাথে পরিপূর্ণতা পেলো। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ-সহ অনেকেই বলেছেন রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা অবদান Individuality বা স্বাতন্ত্রবোধ। এই স্বাতন্ত্রবোধ তো শিশুকাল থেকেই বিদ্যাসাগরে বিদ্যমান। তাই পিতামহ বলতেন 'এঁড়ে বাছুর', পিতা বলতেন নোংরা পোশাক পরতে (যেদিন পরিষ্কার পোশাকের প্রয়োজন)। এরই চরম বহিঃপ্রকাশ কার সাহেবের সামনে টেবিলে পা তুলে দেওয়া। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মানবচেতনা আরও উন্নত হলো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বহুকাল তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের মোড়কে লুকিয়ে রাখা হতো। অনেকটা উইয়ের ঢিবির আড়ালে ঋষি বাল্মিকী। বর্তমানে অবশ্য মোড়ক উন্মোচনের কাজ শুরু হয়েছে। স্বল্প পরিসরে আমরাও সেই চেষ্টাই করবো।

তাঁর মানবাধিকার-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রামের দুটি ক্ষেত্র নারী ও আদিবাসীদের স্বাধিকার-কে আমরা বেছে নিয়েছি। উনিশ শতকের সেই শ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিলেন আধুনিকতার অগ্রদূত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম যোদ্ধা।

বঙ্গদেশে নারীশিক্ষা প্রচলন বিদ্যাসাগরের এক অন্যতম প্রধান কীর্তি তো বটেই, কিন্তু আরও বড়ো কৃতিত্ব নারী-মুক্তির জন্য লড়াই। মাত্র তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে আমরা তাঁর এই প্রচেষ্টাকে চিত্রায়িত করবো।

তিনি সমাজ সংস্কার ও সামাজিক উন্নতিকল্পে যে প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচলন করেছিলেন, তাঁর কয়েকটি সূত্র আমরা উল্লেখ করছি।

'১) কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবো।
২) একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিবো না।
৩) কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যাদি গণনা না করিয়া স্বজাতীয় সৎপত্রে কন্যা দান করিবো।
৪) কন্যা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিবো।
৫) অষ্টাদশ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিবো না।
৬) এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে আর বিবাহ করিবো না।
৭) যাহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তাহাকে কন্যাদান করিবো না।' (৩)

উল্লিখিত প্রতিজ্ঞার ১০টির মধ্যে ৭টিই নারীর অধিকার সংক্রান্ত। ৪নং প্রতিজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে কন্যার সম্মতি ব্যতীত বিধবা বিবাহ হবে না। অর্থাৎ নারীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কখন? যখন নারীকে পণ্য বলে মনে করা হতো। পাত্র-পাত্রীদের বিয়ের ন্যূনতম বয়েস নিয়ে তিনি ভাবছেন, যখন গৌরীদানই ছিলো সমাজের নিয়ম। কৌলীন্য প্রথার অভিশাপ, পলিগমির বিরুদ্ধতা করছেন। ভাবতে অবাক লাগে, উনিশ শতকে বিদ্যাসাগর বলছেন কৌলিন্য না দেখে স্বজাতীয় সৎপাত্র (৩) দেখ, অথচ একুশ শতকে বাহালি বাবা-মা রবিবারের আনন্দবাজারে কুলীন পাত্র/পাত্রীই খুঁজে বেড়ান।

দ্বিতীয় সূত্র হিসেবে সেকালের বিখ্যাত, পতিতা রমণীর বিষয়াধিকারের মামলাটির উল্লেখ করবো। আসামের গোলাঘাটের বিধবা কেরী কলিতানী স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হন। জ্ঞাতি দেওর মণিরাম কলিতা, বিধবার চরিত্রহানীর অপরাধে উত্তরাধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার দাবিতে গোলাঘাটের নিম্ন আদালতে মামলা

করেন। অবশেষে এটি কোলকাতা হাইকোর্টে নথীভুক্ত হয়। ১০ জনের ফুল বেঞ্চ গঠিত হয়েছিলো। এঁদের অন্যতম ছিলেন বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু দ্বারকানাথ মিত্র। শাস্ত্রের মতামত জানার জন্য হাইকোর্ট থেকে বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও আরও একজনকে নিযুক্ত করা হয়। বিদ্যাসাগর ছাড়া বাকী চার পণ্ডিতই রায় দিলেন চরিত্রহানীর জন্য মহিলার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত। দ্বারকানাথ-সহ আরও দুই বিচারপতি, একই মত দিয়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের বিচারে বিদ্যাসাগরের মতটাই গৃহীত হলো। হিন্দু বিধবা চরিত্রহানীর কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন না। পরবর্তীকালে প্রিভি কাউন্সিলও একই রায় দেন। চারিদিকে ছিঃছিঃ পড়ে গেলো। বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় বঙ্গসমাজ মুখরিত হয়ে উঠলো। বলা হচ্ছিলো, এই রায়ের ফলে বিধবারা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাই তিনি ওইরূপ মতামত দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেছিলেন,–

> 'আমি অবশ্য ভ্রষ্টাচারের পক্ষপাতী নই, কিন্তু একজন বিষয়ের অধিকারিনী হইলে, কেমন করিয়া বলিব, আবার সে বিষয়চ্যুত হইবে।' (৪)

কালের নিরিখে বিদ্যাসাগরের অভিমতটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে বিচারপতি দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু, অপর দুই পণ্ডিত, 'ভরত শিরোমণি ও তারানাথ' ছিলেন সহকর্মী ও সহযোদ্ধা। তবু তিনি স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি।

তৃতীয় সূত্রটি 'বারবনিতা'দের নিয়ে। উনিশ শতকে, কোলকাতায় বারবনিতাদের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে তিরিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেরই যাতয়াত ছিলো। সব এলাকায়, এমনকি স্কুল-কলেজের আশেপাশেও এরা বাসা বাঁধতো। ১৮৬২-তেই হুতোম প্যাঁচা তাঁর নকশায় কোলকাতাকে 'বেশ্যাশহর' হসেবে চিহ্নিত করেন। প্রসন্নকুমার পালের বেশ্যাসক্তি নিবর্তক, তারিণীচরণ দাসের বেশ্যা বিচরণ, হরিহর নন্দীর এমন কর্ম আর করবো না, রাধামাধর হালদারের বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি- প্রভৃতি প্রহসন-নকশায় বেশ্যার উপদ্রব এবং এদের প্রতি আসক্তির পরিণাম দেখানো হয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে বারবনিতাদের জন্য স্বতন্ত্র পল্লী নির্দিষ্ট করে দেবার আবেদন জানানো হয়। ভদ্রপল্লী থেকে বেশ্যালয়গুলিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে বিভিন্ন দিক থেকে আবেদন আসতে থাকে। [তথ্যসূত্র: কৈলাসবাসিনীদেবী: রচনাসংগ্রহ। সম্পাদনা অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩১৯] তৎকালীন ব্রাহ্মণ-সহ সকল শিক্ষিত বাঙালি ও মিশনারিরা সবাই বারবনিতাদের বিরুদ্ধেই বলেছেন, প্রস্তাব দিয়েছেন- হয় উচ্ছেদ নয় একঘরে করা হোক। একমাত্র বিদ্যাসগরই তখন মানবিক দৃষ্টিতে সমস্যাটা দেখেছিলেন। তাঁদের নারীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। দু'জনের দুটি রচনা আমরা উদ্ধৃত করছি। প্রথমে বিহারীলাল (পৃ. ২৩৯) পরে ইন্দ্র মিত্র (পৃ. ৩০)

> 'শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে রাত্রিকালে বাড়ি ফিরিবার সময় কোনো অভাগিনী বেশ্যাকে উপার্জন আশায় কষ্টভোগ করিতে দেখিলে, তিনি তাহাকে টাকা-পয়সা দিয়ে সে রাত্রির জন্য তাহাকে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিতেন।'
>
> 'সাতপড়িপতি রায় বলেছেন : "একদা বৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন এক বারাঙ্গনা বর্ষসিক্ত হইয়া আত্মবিক্রয়ের জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। ক্রেতৃবিহীন অথচ এই কুলত্যাগিনী নারীর অন্নসংস্থানের দ্বিতীয় উপায় নাই। বিদ্যাসাগরের করুণ চিত্ত দ্রব হইয়া গেলো, তিনি বারাঙ্গনার হাতে আট আনা পয়সা দিয়া বলিলেন, "যাও মা, আর জলে ভিজো না"।

বেশ্যাবৃত্তির মূল করণ যে 'অন্নসংস্থান' সেটা সেই দুশো বছর আগেই বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

তাই মা সম্বোধন করে, অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে দেন। এটা তাঁর দয়া নয়, করুণা নয়। নারীর শ্রম-মূল্যকে অধিকার দেওয়া। এত বড় মানবপ্রেমিক এই পোড়া দেশে অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন এক স্বপ্নদ্রষ্টা, মানবাধিকার-অর্জন সংগ্রামের পথিকৃৎ। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় তিনি শুধু ভারত কেন, সম্ভবত এশিয়া মহাদেশেই অগ্রগণ্য। তিনিই প্রথম যিনি সাঁওতাল পরগনার আদিবাসীদের সহ-নাগরিকের মর্যাদা দিয়েছিলেন, তাদের সারল্য, সততা, সহজ-সরল সমাজ-ব্যবস্থাকে বহির্বিশ্বে প্রচার করেছিলেন। এশিয়া মহাদেশে নৃতত্ত্বের আলোচনার শুরুও তাঁর হাত ধরে।

জীবনের অন্তিম আঠারো বছর, ১৮৭৩ থেকে ১৮৯১, তিনি কার্মাটাঁড়ে দুঃস্থ দরিদ্র সাঁওতালদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই বিদ্যাসাগর সাঁওতাল পরগনার মানুষের কাছে দেবতা হয়েছিলেন। কোলকাতা থেকে এত দূরে কেন চলে গেছিলেন? সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দৌহিত্র সন্তোষকুমার অধিকারী, জীবনীলেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিহারীলাল সরকার কেউই বিস্তৃত বিবরণ দেননি, শুধু বলেছেন যে ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে এবং সংসার জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়েই তিনি কোলকাতা ত্যাগ করেন। বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের একাংশ এই 'পলায়নী মনোবৃত্তি' নিয়ে বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করেন। কিন্তু সম্ভবত এটা সত্য নয়। ১৮৭৩-৭৪ সালে জনৈক সাহেবের কাছ থেকে বাড়িটি কিনে নাম দিয়েছিলেন 'নন্দন কানন' (বাড়িটি তাঁর সুপুত্র (?) নারায়ণ মাত্র দু'হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন)। এরপরেও বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের পরিচালনা ও উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। (১৮৭৩-য়ে কলেজের স্বীকৃতি, ১৮৭৯-য়ে প্রথম শ্রেণির কলেজে উন্নত, ১৮৮২ সালে আইন পড়া শুরু, ১৮৮৫-তে বি. এ. অনার্স প্রবর্তন), ১৮৭৭-য়ে বাদুড় বাগানে নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ, ১৮৮৬-য়ে সুকিয়া স্ট্রিটে 'দ্য ক্যালকাটা লাইব্রেরি' ন্যামে বইয়ের দোকানের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রমাণ করে তিনি জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তবে স্বাস্থ্যের অবনতিটা ছিলো বাস্তব। কিন্তু তার জন্য দেওঘর/মধুপুর বাদ দিয়ে সাঁওতাল পরগনার কার্মাটাঁড় কেন? সাম্প্রতিক গবেষণা একটা নতুন সম্ভাবনার কথা বলছে। ইংরেজ আমলে দরিদ্র আদিবাসী সাঁওতালদের দুর্বিষহ জীবন-জীবিকা ও তাঁদের সংগ্রামই বিদ্যাসাগরকে তাদের পাশে টেনে এনেছিলো।

১৮৫৬ সালের আগে গ্রেটার বেঙ্গলের অন্তর্গত বীরভূম জেলার জঙ্গল মহলের মধ্যেই ছিলো মধুপুর, দেওঘর, জামতোড়া প্রভৃতি অঞ্চল। তখন সাঁওতাল পরগনার অস্তিত্বই ছিলোনা। মিরকাশীম পরাস্ত হতেই ব্রিটিশরা নির্বিরোধী-শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার শুরু করে। জাহাজ, বাড়ি ও আসবাব নির্মাণ, খনি এবং রেল কামরা ও লাইনের স্লিপারের জন্য কাঠের প্রয়োজনে অরণ্য ধ্বংসের ফলে সাঁওতাল-জীবন বিপর্যস্ত হয়। শত অনুরোধেও বৃক্ষছেদন বন্ধ হয়নি। এর উপর ছিলো ঔপনিবেশিক শাসন সঞ্জাত মধ্যসত্বভোগীর উৎপীড়ন, অর্থাৎ জমিদারদের ইচ্ছামতো খাজনা বৃদ্ধি ও মহাজনী শোষণ। ১৮৫৬ সালের ক্যালকাটা রিভিউ-য়ের বর্ণনার সামান্য অংশ থেকেই এর স্বরূপ বোঝা যাবে।

> 'জামিদার, আরও যথাযথভাবে বলিলে, গোমস্তা, সরবরাহকার, পিওন ও মহাজন প্রভৃতি জমিদারি কর্মচারীবৃন্দ, পুলিশ, রাজস্ব আদায়কারী (নায়েব, সাজোয়াল) এবং, আদালতের আমলা- কর্মচারীগণ সকলে একত্রে মিলিয়ে সাঁওতালদের অপমানিত করা এবং প্রহার ও

অন্যান্য প্রকার উৎপীড়নের জাল বিস্তার করিয়াছে। ঋণের সুদ শতকরা পঞ্চাশ টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত আদায় করা হইতেছে।' (৭)

উৎপীড়ন ও অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালরা সিধু-কানু, চাঁদ ভৈরবদের নেতৃত্বে মহাজন, জমিদার ও রেলওয়ে ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন অরণ্য ধ্বংস ও উপরোক্ত শোষণের বিরুদ্ধে লাট সাহেবকে নালিশ জানাতে ভারতের তৎকালীন রাজধানী কোলকাতার উদ্দেশে আনুমানিক যাট হাজার সাঁওতালদের এক বিশাল গণ-মিছিল রওনা হয়। কোলকাতা যাওয়ার পথে ময়ূরাক্ষী নদী পার হওয়ার সময়, রাণীশ্বর ব্লকের আমজোড়া ঘাটে ইংরেজ সৈন্যরা গুলি চালিয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার সাঁওতালকে হত্যা করে। ময়ূরাক্ষীর জল রক্তে লাল হয়ে যায়। অনেকের মৃতদেহ সৈনারা পাশের একটা পুকুরে ফেলে দেয়। সেটা এখনও সাঁওতাল-কাটা-পুকুর নামে পরিচিত। সিউড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন কেন্দুঁয়া জঙ্গলে বিদ্রোহীদের গণ-কবর দিয়ে ইংরেজরা বিদ্রোহ দমন করেন এবং তার পরেই সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজের সৃষ্টির অজুহাতে ১৮৫৬ সালে বীরভূমের পশ্চিমভাগকে সাঁওতাল পরগনা নামকরণ করে স্বতন্ত্র জেলা ঘোষণা করা হয়।

এই বিদ্রোহী দরিদ্র মানুষগুলোকে সাহায্যের জন্যই তিনি সুদূর কার্মাটাঁড়ে ছুটে গেছিলেন। অর্থাৎ জীবন থেকে পলায়ন নয়, জীবনস্রোতে ঝাঁপ দেওয়া। কিন্তু খবর পেলেন কোথা থেকে? তৎকালীন সংবাদমাধ্যম ও সমাজ পুরো বিষয়টা নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলো। সংবাদদাতা সম্ভবত বর্ধমানের আবদুল জব্বার। ইনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের আইনজ্ঞ বন্ধু গোলাম আসগর জায়েদির ছেলে এবং সাঁওতাল পরগনার দ্বিতীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বর্ধমানে ম্যালেরিয়া- ত্রাণকার্যে আবদুল জব্বারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠতা হয়।

আদিবাসীরা মিথ্যাচার ও লোভের জন্য তথাকথিত ভদ্র বাঙালিকে সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে তারা আপন করে নিয়েছিলো। দাদা, বাবা, জ্যাঠা প্রভৃতি সম্পর্ক পাতিয়েছিলো। তিনি অসুস্থ শরীরেই প্রতি সকালে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরতেন, প্রত্যেকের খোঁজ নিতেন, রোগীর চিকিৎসা করতেন, পথ্য দিতেন। তাঁর হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা তাদের কাছে দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ ছিলো। লোক খাওয়ানো ছিলো বিদ্যাসাগরের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাঁওতালদের খাওয়ানোর মধ্যে যে স্বাভাবিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা, সেটা অন্যত্র দেখা যেতো না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তাঁর অবিস্মরণীয় রচনায় (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ'-য়ের ভূমিকা) স্মরণীয় করে রেখেছেন বিদ্যাসাগরের খাওয়ানো। সাঁওতালদের ভুট্টা কিনে, তাও আবার তাদের নির্ধারিত দামেই, তাদের খাওয়াতেন। ঘটনাকাল ১৮৭৮ সালে সেপ্টেম্বর।

'..তাহারা উঠিয়া বলিলো– খুব খাইয়েছিস বিদ্যাসাগর। ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিলো। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, আমিও আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম; ভাবিলাম এ রকম কেউ বোধহয় আর দেখিতে পাইবে না।' (৮)

এই যে খাওয়ানো বা উপহার দেওয়া, এটা কিন্তু একতরফা ছিলো না। সাঁওতালরা খেতের ফল-মূল, এমনকি পোষা মুরগি তাঁর হাতে তুলে দিত। মাংস খান না বলে, মুরগি নিতে অস্বীকার করলে কেঁদে ভাসাত। বাধ্য হয়ে নিতেন। যিনি বর্ধমান রাজপরিবারের রাজ-আতিথ্য, ব্রাহ্মণদের সম্মান-দক্ষিণা দেওয়ার বাজ-সংস্কার, বীরসিংহ গ্রাম পত্তনী দেওয়ার প্রস্তাব- সবকিছু অবলীলায় প্রত্যাখান করেন, তিনিই কার্মাটাঁড়ে পড়শীর দেওয়া উপহার সানন্দে গ্রহণ করছেন, পইতাধারী গ্রহীতা মুরগি হাতে নিয়ে হাসছেন, পড়শীদাতারাও হাসছে। সাঁওতালরা তাঁকে নিজেদের লোক বলেই ভাবতো।

তাই তো নির্দ্বিধায় ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে শাড়ি নিতো, বাছাবাছি করতো, কখনও বা বিদ্যাসাগরের গায়ে পড়তো। সুখে বিদ্যাসাগরকে সংবাদ দিতো, দুঃখে আশ্রয় নিতো। হয়তো এই অশিক্ষিত, দরিদ্র কিন্তু সৎ-সরল সাঁওতালদের সান্নিধ্য তাঁর সাময়িক স্থবিরতা দূর করে দিয়েছিলো। তিনি নতুন উন্মাদনায় জেগে উঠেছিলেন।

> 'বিদ্যাসাগর এদের মধ্যে নতুন একটা জগৎ খুঁজে পেলেন। তিনি বন্ধু হয়ে গেলেন সেই আদিবাসী মানুষদের। তাদের পরিশ্রমজাত দ্রব্যাদি যা বাজারে বিক্রি হতো না, তিনি নিজেই কিনে নিতেন। তারপর আবার বিলিয়ে দিতেন, যারা বেশী দুঃস্থ তাদের মধ্যে। বাগানে ঢুকবার দরজার পাশে যে তিনটি ঘর ছিলো, সেগুলিতে থাকতো দূরের গ্রাম থেকে আসা রোগীরা।' (১)

বিদ্যাসাগর ওখানে স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ওই অঞ্চলের প্রথম স্কুল। স্কুল চালানোর জন্য মাসিক বরাদ্দ ছিলো। লোকমুখে শোনা যায় কার্মাটাঁড়ের অনুর্বর জমিকে উর্বর চাষযোগ্য জমিতে পরিণত করার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও বিদ্যাসাগর যে কৃষিকাজ ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে পড়াশোনা করতেন তাঁর লাইব্রেরি সেই প্রমাণ দেয়। মাটির কাছাকাছি অনাবিল আনন্দের মাঝে বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকতে চাইতেন। কার্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের সঙ্গে তাঁর পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো, যা কোলকাতার তাঁর স্বশ্রেণির মানুষের সঙ্গে কদাচিৎ স্থাপিত হতে পেরেছিলো। শহরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভাল হয়।' কিন্তু সাঁওতালদের মধ্যে তিনি মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন এক অনাহত ঐক্যের বাতাবরণ ছিলো যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনে হয়েছিলো 'যেন কোনও মহর্ষির আশ্রম।' রবীন্দ্রনাথও এই ঐক্যের সূত্রটি সম্পর্কে লিখেছেন,–

> 'সরল ও সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালদের সহিত আপনার যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।' (১১)

বিদ্যাসাগর তাঁর হতাশা ও ক্ষোভের সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন মানুষের মধ্যেই।

পৌরাণিক যুগ থেকে আজ অবধি ভারতের জনজাতি অর্থাৎ আদিবাসীদের একমাত্র পরিচয় ওরা বর্বর, অসভ্য, হিংস্র খুনি। পৌরাণিক রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ গঠনের জন্য আদিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে খান্ডব্বন দহন করা হয়। আবার কয়লা-তেল উত্তোলনের জন্য আদিবাসীদের গণতান্ত্রিক ভারতে বাস্তুচ্যুত করা হয়। ২০১২ সালে ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্কিং গ্রুপ অন হিউম্যান রাইটস ইন ইন্ডিয়া'-র পক্ষ থেকে একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিলো যে আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকে বাঁধ নির্মাণ, খনিজ উত্তোলন, শিল্পায়ন-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ছয় থেকে সাড়ে ছয় কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়, যা কিনা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। এদের ৪০ শতাংশেরও বেশি আদিবাসী এবং ৪০ শতাংশ গ্রামীণ গরিব ও দলিত। এই প্রান্তিক মানুষদের অধিকাংশই যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পাননি। গত এক দশকে এই ধারার কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। এখনও উন্নয়নের নামে কলোনি, বস্তির উপর বুলডোজারের হানাদারি চলছে। কর্পোরেটের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে নির্বিচারে প্রান্তিক মানুষের উচ্ছেদ চলছে। আজ থেকে দুশো বছর আগেই, বিদ্যাসাগর এক প্রান্তিক, দলিত তথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানবাধিকার রক্ষার

সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ভারত তথা এশিয়া মহাদেশে বিদ্যাসাগরই সর্বজনের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রূপায়ণে পথিকৃৎ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শ্রমকে মূল্য দিয়ে তিনি তাদের সহ-নাগরিকের মর্যাদা দিয়েছিলেন। এই কাজে তিনি ধর্ম ও ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র থেকে ঈশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। তাই ১৮৯১-এর ২৯ জুলাই একমাত্র কার্মাটাঁড়েই প্রান্তিক জনপদে সেই আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল– নাই- আমাদের ঈশ্বর নাই।

প্রামাণ্যসূচী–

(১) চরিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী, প.ব. সরকার, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯৩।

(২) বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। বিনয় ঘোষ। প. ৩৭০।

(৪) বিদ্যাসাগর। বিহারীলাল সরকার। পৃ. ৩৩২।

(৩) বিদ্যাসাগর। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ. ২৩৩।

(৫) ওই। পৃ. ২৩৯।

(৬) করুণাসাগার বিদ্যাসাগর। ইন্দ্র মিত্র। পৃ. ৩০।

(৭) বিদ্যাসাগর, সোমপ্রকাশ পত্রিকা ও বাংলার কৃষক সমাজ। পূর্ণেন্দু শেখর মিত্র, সংবর্তক। পৃ. ৫১৬।

(৮) কার্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। The Golden Book fo Bidyasagar. পৃ. ৬২৯।

(৯) কার্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর। সন্তোষ কুমার অধিকারী। পৃ. ৩৫।

(১০) রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ। একাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৩৩।

সহায়ক গ্রন্থ–

(১) করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। ইন্দ্র মিত্র। আনন্দ। ২০১৯।

(২) বিদ্যাসাগর। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রভৃতি সংস্করণ। ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

(৩) বিদ্যাসাগর। বিহারীলাল সরকার। সম্পা, প্রলয়কুমার প্রামাণিক। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ১৯৮৬।

(৪) বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়াল প্রা. লি.। ২০২৩।

(৫) রবীন্দ্র রচনাবলী। প.ব. সরকার প্রকাশিত।

(৬) সংবর্তক পত্রিকা, জানুয়ারি, ২০২০।

(৭) কৈলাসবাসিনী দেবী: রচনা সংগ্রহ। সম্পাদনা অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। ২০১৯।

মুক্ত করো ভয়

গৌতম রায়চৌধুরী

আর জি কর মেডিকেল কলেজে ৯ই অগাস্ট রাত সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে আমাদের তিলোত্তমাকে পাশবিক অত্যাচারের পরে খুন করা হয়েছিলো। আজ ঘটনার তিন সপ্তাহ পার করেও বিচার অধরা!

প্রথমে হাসপাতাল, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে ঘটনাটা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছিলো। হাসপাতালের পক্ষ থেকে এক বামা কণ্ঠধারিনী আধিকারিনি তিলোত্তমার মা-বাবাকে আত্মহত্যার খবর শুনিয়েছিলো। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা হলো। অস্বাভাবিক ব্যস্ততার সঙ্গে মৃতদেহ দাহ করার চেষ্টা চলছিলো। সৌভাগ্যবশত সেই সময় যুবনেত্রী মীনাক্ষীর নেতৃত্বে ডি ওয়াই এফ-এর সদস্যরা ঝাপিয়ে না পড়লে হয়তো চুপিসারে শবদাহ হয়ে যেতো। তড়িঘড়ি করে সঞ্জয় রায় নামক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ধরা হলো এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে দাবি উঠলো, আসল অপরাধী ধরা পড়ে গেছে- ফাঁসি দাও বা গুলি করে মেরে ফেলো। কিন্তু তখনো অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন আগামী চারদিনের মধ্যে কোলকাতা পুলিশ

সমস্যার সমাধান করতে না পারলে সিবিআই-এর হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হবে! স্বভাবতই তিলত্তমার মা এবং বাবা রাজি হলেন না। মহামান্য কোলকাতা হাইকোর্ট পুলিশ, হাসপাতাল এবং প্রশাসনকে কার্যত তুলোধোনা করে তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দিলো। পরবর্তীকালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও একই রায় দিলো। সিবিআই তদন্ত হাতে নেওয়ার পরেও ১৬ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও মূল প্রশ্নের উত্তর অধরা।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ এমনকি বিদেশেও ঘটনাটি জনমানসে বিশাল ছাপ ফেলেছে। আমরা সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারছি এই ঘটনাটি কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ড নয়। এটা কোনো যৌন লালসার দরুন ঘটে যাওয়া হত্যা নয়। এটা চিরকালীন পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতার দম্ভ দেখানো নয়। এই হত্যাকাণ্ড একটা গভীর দুর্নীতির বহিঃপ্রকাশ। কেনো এই ষড়যন্ত্রের ধারণাটা মানুষের মনে বদ্ধমূল হলো?

ঘটনাস্থল নিয়ে ধোঁয়াশা-সেমিনার রুম না অন্য কোথাও?

ঘটনার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে পুলিশে এফ আই আর।

তড়িঘড়ি শবদাহ- হাসপাতালে অত্যাধুনিক মর্গের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেহ সংরক্ষিত হলো না।

রাতের ডিউটিতে কর্মরতা ডাক্তারের খোঁজ সকাল নটার আগে কেন পরলো না?

সেমিনার রুমের অদূরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘর ভাঙ্গার অনুমতি, সর্বোপরি ১৪ই আগস্ট তারিখ রাতে বহিরাগত গুণ্ডাদের দ্বারা হাসপাতাল তছনছ করা- এই সমস্তই তথ্য প্রমাণ লোপের চেষ্টা বলেই আমাদের ধারণা। সর্বোপরি হাসপাতালের অধ্যক্ষকে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে আড়াল করার চেষ্টা। এক বছর আগে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির লিখিত প্রমাণ থাকলেও চুপ করে বসে থেকে ঘটনা ঘটার পরে নড়েচড়ে বসা। হাসপাতাল থেকে অপসারণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন হাসপাতালে প্রমোশন। আইএমএ বহিষ্কৃত করলেও কর্মকর্তা স্বাস্থ্য দপ্তর এখনও নীরব!

জনগণ চাইছে শুধু অপরাধীদের বিচার নয় এ সকল প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হবে। সিবিআইকে মনে রাখতে হবে এবারের তদন্ত শুধু আদালতের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে না, জনতার আদালতেও তাকে জবাব দিতে হবে। ততোদিন জনতার আন্দোলন চলছে চলবে।

ঈশ্বরের মুখে হাসি, চোখে জল

গৌতম রায়চৌধুরী

উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে। ১৮২৯-এর ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা বন্ধ হলো। কিন্তু ভারতীয় নারীদের দুঃখের অবসান হলো না। নারীশিক্ষা তখন পাপাচারের নামান্তর। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে-এটাই ছিলো প্রচলিত মত। বিধবারা সমাজের এক কোণে পড়ে থাকতেন। পারিবারিক-সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানে তাঁদের কোনও উপস্থিতি ছিলো না। বিড়াল পার করানোর মতো তাদের কাশী-বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সেখানে বাঙালি বিধবাদের সংখ্যা ছিলো সবচেয়ে বেশি। তৎকালীন লোক গণনায় দেখা যায় কোলকাতায় বেশ্যাদের মধ্যে এক বড় অংশ অভিজাত বাঙালি বিধবা। বাল্যবিধবা হৈমবতীর কথা শুনুন–

'যে সব মা-বাবা'রা নিজের কন্যার জীবনকে এমন উষর মরুতে পরিণত করেন, তাদের খুরে খুরে শতকোটি প্রণাম।...ভারতেই একমাত্র নারীদের এমন আখমাড়াই কলে পেষা হয়, অন্যত্র কোথাও এমনধারা রীতির চল নেই।'

[ডা. হৈমবতী সেন-এর জীবনকথা, প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, পৃ. তেরো।]

বিধবাদের উপর অত্যাচারের মূল কারণ ছিল আর্থিক- মৃত স্বামীর সম্পত্তির ভাগ না দেওয়া। বাল্যবিধবাদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের শেষভাগে আক্ষেপ করেছেন–

'হে ভারতবর্ষীয় মানবগণ। ...একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। ...যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিতবোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লোকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!'

[বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ। দ্বিতীয় খণ্ড। সাক্ষরতা প্রকাশন। প.ব. নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। পৃ. ১৫৫।]

বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৬-এর ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন হলেও হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ খুব বেশি প্রচলিত হল না। এই প্রেক্ষাপটেই আজকের কাহিনি।

হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম শরৎচন্দ্রের কল্যাণে সুপরিচিত। এখানকার খ্যাতনামা দত্ত মুন্সী পরিবারে, আমাদের কাহিনির নায়িকা শিবমোহনীর ১৮৫২ সালে জন্ম। পিতা চণ্ডীচরণের আদরের মেয়ে শিবমোহিনী। কপাল খারাপ। শৈশবে মাতৃহারা। বিমাতার চোখের বালি। বাবাও জজিয়তি সূত্রে বিহারে থাকতেন, তাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে দশ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিন্তু দু-বছরের মধ্যে বিধবা হয়ে আবার সেই পিতৃগৃহেই ফিরতে হলো। বিমাতার গঞ্জনা আরও বেড়ে গেল। যোগ হলো শেমিজ ছাড়া এক কাপড়ে থাকা, সিঁড়ির তলায় খালি মেঝেতে শোয়া, একাদশীর নির্জলা উপবাস ইত্যাদি, ইত্যাদি। চণ্ডীচরণ তখন গ্রামেই, কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস নেই। শিবমোহিনীর সই পাশের বাড়ির হেমাঙ্গিনী। তাঁর বাবা সপরিবার ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে কোলকাতায় চলে যাওয়া স্থির করলেন। ইতিমধ্যে সুদুর দেবানন্দপুরেও বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবা বিবাহের খবর পৌঁছে গেছে। হেমাঙ্গিনীর পরামর্শে শিবমোহিনী কোলকাতায় যাওয়া স্থির করলেন। গঙ্গা স্নানের জন্য বাবার অনুমতি নিয়ে, হেমাঙ্গিনীদের পরিবারের সঙ্গে কোলকাতায় চলে এলেন। বিমাতা রটিয়ে দিলেন শিবমোহিনী কুল ত্যাগ করেছেন।

যথারীতি কয়েক দিন বাদে দু'বন্ধু মিলে বিদ্যাসাগরের বাড়ি চলে এলেন। বাজার ফেরত তাদের রকে বসে থাকতে দেখে, ঘরে নিয়ে এসে সব কথা শুনলেন। সেই সময়, টাকার লোভে অনেকেই বিবাহিত স্ত্রীর কথা গোপন করে বিধবা বিবাহ করছিলো, কেউ আবার বিয়ের পর, স্ত্রী পরিত্যাগের হুমকি দিয়ে আরও টাকা দাবী করতো। বোঝা যাচ্ছে, বাঙালির দুর্নীতি তখন থেকেই শুরু। ফলে বিদ্যাসাগর নতুন বিধবা বিবাহের আগে অনেক খোঁজ-খবর করছিলেন। স্বভাবতই সেটা অনেক সময় সাপেক্ষ। তাই তিনি বললেন– গ্রামে ফেরার আর দরকার নেই। এখানেই থাক। কাজ-কর্ম শেখ। তারপর ব্যবস্থা হবে।

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে শিবমোহিনীর নতুন জীবন শুরু হলো। শিক্ষা সম্পন্ন হলো। অতিথি আপ্যায়ণ ও সহবত শিখলেন। রন্ধনশিল্পে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগরের প্রিয় বেল পোড়া-মোরব্বা বা অন্যান্য মিষ্টি, সব বানাতে পারতেন।

অবশেষে বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্র সেনের ভক্ত,

ব্রাহ্ম চণ্ডীচরণ সিংহের সঙ্গে শিবমোহিনীর বিয়ে স্থির করলেন, পাত্র বিদ্যাসাগর নিজে দেখে পছন্দ করেছেন। ব্রাহ্মমতে বিয়ে হয়। বিদ্যাসাগর কন্যা সম্প্রদান না করতে পারলেও, আদরের 'শিবু'র জন্য দানসামগ্রী নিজে পছন্দ করে কিনেছিলেন। বিয়ের পর শিবমোহিনী চণ্ডীচরণের প্রথম পক্ষের সন্তানদের সযত্নে মানুষ করেন। নিজের কোনও সন্তান না হলেও, সৎ ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে সুখে ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় তিনি ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করেন। আত্মীয়-পরিজন ছাড়াও দুঃখী মানুষদের প্রয়োজনে ছুটে যেতেন। এমনকি, অবৈধ সন্তানের জন্মের সময় শিবমোহিনীর উপস্থিতি অনেক শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছিল। এমনই দুটি অবৈধ শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, পরে জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

আজকের এই অবক্ষয়ের যুগে একটা স্বপ্ন দেখতে বড় ইচ্ছা করে। শিবমোহিনী শান্তিপুরি শাড়ি পড়ে, যার আঁচলে স্বর্ণাক্ষরে লেখা- 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে। সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে', সৎ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সেই অবৈধ দুই শিশুর পরিচর্যা করেছেন, অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন আমার ঈশ্বর, বিদ্যাসাগর তাঁর মুখে হাসি, চোখে জল।

তথ্যঋণ : শিবমোহিনী ও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ। কল্যাণী দত্ত।
গতদিনের যত কথা। কল্যাণী দত্ত।

আবোল তাবোল?

গৌতমরায়চৌধুরী

শীর্ষ নামটি বিশেষ্য পদবাচ্য হতে পারে (কোনো বইয়ের নাম), আবার বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে (বর্তমান সময়-সমাজের পরিচায়ক)। যদি বইয়ের নাম ধরি তবে, 'শ্রী সুকুমার রায়, বি. এস-সি; এফ. আর. পি. এস কর্তৃক লিখিত ও চিত্রিত' এবং ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'ইউ, রায় এন্ড সন্স কর্তৃক' প্রকাশিত। অর্থাৎ শতবর্ষের পুরানো একটি বই। কিন্তু এমনই তার প্রভাব, আজও মনে হয় সে যেন নতুন। ১৪৩০ তো বটেই ১৫৩০-এও সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল এক সদ্য প্রকাশিত বই হিসেবেই থেকে যাবে। প্রকৃতপক্ষে আবোল-তাবোল ১৩৩০-এর আগেও ছিলো না, এখনও নেই।

ছোটদের ছড়াকার বলে পরিচিত সুকুমার আদতে এক নীরব বিপ্লবী। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য রবীন্দ্রোত্তর কবিরা অনেক চেষ্টা করেছেন, কেউ কেউ কবিতায় পদাঘাতে রবীন্দ্র রচনাবলীকে পাপোষে লুটিয়েছেন, কিন্তু আজও বাংলা কবিতা 'আমি'-কেন্দ্রিক রোমান্টিক কবিতাই রয়ে গেছে। সামান্য যে কয়েক জন বিভিন্ন ধারায় চেষ্টা করেছেন, খুব একটা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেননি। সুকুমার রায় প্রথম ভাববাদ থেকে জড়বাদের কঠিন মাটিতে পা দিলেন। বিজ্ঞান ও হাস্যরসের মুখোস পরে সমাজের অসংগতিকে অনায়াসে আঘাত করলেন। প্রচলিত কাঠামোর (রাজনৈতিক ও সামাজিক) ভণ্ডামি, শাসকের চরম নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষমতাকে হাস্যরসের ছদ্মবেশে বারংবার আঘাত করেছেন। নিজেই বলেছেন, 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই।' এই যে 'উদ্ভট-ছদ্মবেশ'- সেটা উন্মোচন করতে আমাদের লেগে গেলো একশো বছর।

এডওয়ার্ড লিয়র বা লুইস ক্যারলকে অনেকেই

সুকুমারের পূর্বসূরি বলেন। কিন্তু শুধু উদ্ভট রস অবধিই তাঁদের সঙ্গে, উত্তরণটা একমাত্র সুকুমারেই আছে। উদ্ভট রসের আড়ালে শাসককে ব্যঙ্গ, যা কালোত্তীর্ণ হয়ে আজও সমভাবে প্রযোজ্য শুধু সুকুমারেই উপলব্ধ। আমরা আবোল তাবোলের মোট ৪৫টি কবিতার মধ্যে মাত্র চারটি কবিতার সাহায্যে এই সত্যটা ধরার চেষ্টা করবো। মূল বইয়ের ক্রম অনুযায়ী কবিতা চারটি হলো কুমড়োপটাশ (পৃ. ১২), বোম্বাগড়ের রাজা (পৃ. ২৭), একুশে আইন (পৃ. ২৮) এবং ভয় পেয়োনা (পৃ. ৪৬)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে। তরুণ সুকুমার, তখন বিলেতে অধ্যয়নরত। দেশে-বিদেশে মানবতা বোধ ধীরে ধীরে ধ্বংস হচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আবার ইউরোপে যুদ্ধের পটভূমি অনুভব করেছিলেন। শাসকের ক্ষমতার লোভ, আত্মগরিমা, ধূর্ততা, দুর্নীতি, টিকে থাকার চেষ্টা সে তো আমরা এখনও উপলব্ধি করি। কিন্তু তাদের কাজের মধ্যে যে একটা নির্বুদ্ধিতা আছে, যেটা উদ্ভট, আজগুবি সেটা সুকুমার আমাদের চিনিয়েছেন। চ্যাপলিনও তার চলচ্চিত্রে হিটলারকে নিয়ে (গ্রেট ডিকটেটর), আধুনিক যন্ত্র সভ্যতাকে (মডার্ন টাইমস) নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। ফ্যাসিজমের মুখে দাঁড়িয়ে হাসিয়েছেন আবার প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন। তবে মনে রাখতে হবে সুকুমার কিন্তু চ্যাপলিনেরও পূর্বসূরী।

ক্ষমতার লোভে শাসক যে কতোটা নির্বোধ হতে পারে, কুমড়োপটাশ তার প্রমাণ। সুকুমারের ইলাস্ট্রেশনে যেন আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকে বলেন কুমড়োপটাশ তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে উদ্দেশ্য করে রচিত। সেটা না জানলেও আমাদের কিছু ক্ষতি নেই বুঝতে কিচ্ছু অসুবিধা হয় না। (যদি) কুমড়োপটাশ নাচে–/ খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে;/ চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে;/ চারপা তুলে থাকে ঝুলে হট্টমূলার গাছে!' কুমড়োপটাশে বা শাসক যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মনে হয় আজগুবি, উদ্ভট কিন্তু আদতে এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা। এই আবোলতাবোল ঘটনা তো আজও আছে। সুকুমার-পুত্র-সত্যজিৎ কৃত একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় চরিত্রকে নিয়ে শাসক দলের নেতাদের কার্টুন, শুধুমাত্র ফরোয়ার্ড করার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের হাজতবাস পর্যন্ত হয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় মুক্ত হয়েছেন। রান্নাঘরের পাশে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, জানলা বেয়ে তড়তড়িয়ে ওঠা বা শাম্‌লা এঁটে গামলা চড়ে থাকা- কবিতাটির বিভিন্ন নিদান শুনে যখন আমরা হাসছি তখন কবি আমাদের সাবধান করে দেন-'তুচ্ছ ভেবে এসব কথা করছে যারা হেলা/কুমড়োপটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।' কী বুঝবো। কেন 'একুশে আইন'-এ তার বিধান দেওয়া আছে। 'শিবঠাকুরের আপন দেশে/ আইন কানুন সর্বনেশে/ কেউ যদি যায় পিছলে প'ড়ে/ প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,'। হুঁ হুঁ বাবা, চল নিয়ম মতো। 'চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়,/ এদিক ওদিক ডাইনে বাঁয়ে,/ রাজার কাছে খবর ছোটে,/ পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,'। এতো আজকের ছবি, কবিতার শিবঠাকুরের দেশ সে যে আমার জন্মভূমি। আমাদের রাজা বলেন থালা বাজিয়ে কোভিড মোকাবিলা করা যাবে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যায় কোভিড অতিমারীকেও আঠারো দিনে জয় করে নেওয়া যাবে। রাজার সুরে সুর না মেলালে হয় আরবান নকশাল বা দেশদ্রোহী- কালবুর্গি, দাভালকর প্রমুখ যার সাম্প্রতিক উদাহরণ।

রাজ্যের এক মন্ত্রী কেন্দ্রের প্রস্তাবিত 'ন্যায় সংহিতা' বিল নিয়ে বিধানসভায় বলেছেন, [৬ ডিসেম্বর ২৩, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত] এই বিল ন্যায় বিচারের পরিপন্থী, 'শুধু সন্দেহের বশেই মানুষকে গ্রেফতার করা হবে'। যথার্থই বলেছেন। মুশকিল হচ্ছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও একই দমন-পীড়নের অভিযোগ। ওই দিনেরই

আনন্দবাজারের একই পাতায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় কোলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই পুলিশ মামলা করছে বলে তার থেকে অব্যাহতি চাওয়ার আর্জিতে যুক্তি আছে। অর্থাৎ একুশে আইন কবিতায় সুকুমার ঔপনিবেশিক আইনের কথা বললেও তা আজও কেন্দ্র-রাজ্য দু-জায়গাতেই সমভাবে প্রযোজ্য।

বোম্বাগড়ের রাজা 'ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত ভাজা।' নির্বোধ রাজ্য যা খুশি তাই করে, সঙ্গে যোগ দেয় নিকটজনেরা- রাণীর মাথায় বালিশ বাঁধা, রাণীর দাদা পাউরুটিতে পেরেক ঠোকেন, মন্ত্রী রাজার কোলে বসে কলসী বাজায় আর কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলে রাজার পিসী? এই গন-পাগলামির কারণ কী। 'এমন কেন ঘটছে তা কেউ বলতে পার মোরে'। না, তা পারি না, তবে এটা যে এখনও ঘটছে সেটা দেখতে পাচ্ছি। কোনও একদিন রাজার মনে হলো নোট বাতিলই কালোটাকা আটকানোর একমাত্র উপায়, তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি। অর্থনীতি তোলপাড়, সাধারণ মানুষের জীবন ছারখার। ২,০০০ টাকার নতুন নোট ছাপা হলো, নতুন ট্রে বানিয়ে এটিএমগুলোকে উপযোগী করা হলো। সব মিলিয়ে খরচ হলো মাত্র ১,৭৩০ কোটি। বছর তিনেক বাদে সম্প্রতি সেই নোট আবার বাতলি করে দেওয়া হলো। আরও উদ্ভট, পুরানো নোটের ৯৫ শতাংশ যথাসময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ফেরৎ চলে এসেছিলো। রাজা শুধু নন, পারিষদগণ বলে তার চারগুণ। গোরুর দুধে সোনা আর চোনায় সর্বরোগের ওষুধ আছে, পৌরাণিক পুষ্পক রথ এবং গণেশের হস্তীমুখ প্রমাণ করে ভারতেই সর্বপ্রথম বিমান উড়েছিলো ও সফল অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়েছিলো। চারপাশে তাকালে বোম্বাগড়ের রাজা, রাজার পিসি, রানি, রানির দাদা, রাজার মন্ত্রী সবাইকে দেখতে পাবেন। শুধু নাম বদল হয়েছে। উল্লিখিত তিনটি কবিতা একসঙ্গে পড়লেই একনায়ক ও তার নির্বুদ্ধিতা, সহযোগীদের তালে তাল মেলানো এবং প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ, সহজেই একটা সরলরৈখিক যোগসূত্র খুঁজে পাবেন।

অবশিষ্ট কবিতা 'ভয় পেয়ো না'-তে তিনি সরাসরি এক ঠান্ডা মাথার ভয়ংকর একনায়ককে চিত্রিত করেছেন ও হাড়-হিম-করা মোনোলোগে কীর্তিকলাপ বর্ণনা করেছেন। সেই তিন-শিং ওয়ালা, সজারুর কাঁটা লাগানো, হাতে মুগুর নিয়ে কিম্ভুত জীবটি বলছে, 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না-/সত্যি বলছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পারব না।/মনটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগটি নেই,/তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই।'– আদতে কিন্তু ভয় দেখাচ্ছে। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হামেশাই হই, আগেও হয়েছি হয়তো পরেও হবো। আমাদের মনে পড়ে, সৌমিত্র অভিনীত বয়স্ক মাস্টারমশাইকে ধর্ষণকারী যুবক শান্ত গলায় বলছে, 'মাস্টার মশাই, আপনি কিন্তু কিছু দেখেননি'।

তাই আমরা কিছু দেখি না, ভয়ে চুপ করে থাকি। কারণ- 'আমি আছি, গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে-/সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় ফেলে।' রাজা আছেন, পুলিশ আছে আর আছে স্থানীয় মস্তানবাহিনী। তাই আমরা সুকুমার অঙ্কিত ছবির মতো ছাতা হাতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় লাগাই।

আমরা যারা জীবনের শেষ ইনিংসে মহাকালের সামনে বুক চিতিয়ে ব্যাটিং করছি, তাঁদের চোখ মাঝে মাঝেই 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের শেষ চারটি লাইনের দিকে চলে যায়, প্রসঙ্গত এগুলোই কবির লেখা শেষ চার লাইন।

'আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সঙ্গে মোর।'

ঈশ্বরের বন্ধুবিচ্ছেদ

গৌতম রায়চৌধুরী

"বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে
ভেঙ্গে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধু ধু
খেলার বয়স পেরোলেও একা ঘরে
বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।"

'সাঁকোটা নড়ছে', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এই কাতরতা তো আমাদের মানায়, সাধারণ মানুষের 'দুনিয়া খাঁ খাঁ করে'। ঈশ্বর, যিনি নিরাকার, তাঁর আবার দুঃখ কিসের! কিন্তু আমাদের ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রক্ত মাংসের মানুষ। তাঁর বন্ধুভাগ্য ঈর্ষনীয়। কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, শ্যামচরণ দে, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, কালীচরণ ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের বন্ধু বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন। বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব শুধু মুখের কথায় বা চিঠিতে সীমাবদ্ধ থাকতো না। সকলের খবর রাখতেন, বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, বন্ধুদের বিপদকে নিজের বিপদ বলে মনে করতেন।

বারাসত নিবাসী বন্ধু কালীকৃষ্ণ মিত্রকে একবার শারিরীক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘকাল গঙ্গাবক্ষে নৌকাবাস করতে হয়েছিলো। বিদ্যাসাগর সেই সময় বন্ধুর চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁর সঙ্গে গঙ্গায় কাটিয়েছিলেন। এক বন্ধুর স্ত্রী তাঁকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কেউ তাঁকে খাওয়াতে পারতেন না। বিদ্যাসাগর একটানা ছয় মাস বেলা দশ'টার সময় নিয়মিত তাঁকে স্বহস্তে খাওয়াতেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যখন সাংঘাতিক এক অসুখে মুমূর্ষু ও শয্যাগত, তখন তিনি প্রায়ই ডাঃ সরকারের বিছানার পাশে বসে থাকতেন। নিজের ছেলে, নারায়ণের বাসি বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন খবর পেলেন, কৃষ্ণনগরে বন্ধু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায়। সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান ছেড়ে ডাঃ মহেন্দ্রলালকে নিয়ে কৃষ্ণনগরে চলে যান এবং বন্ধু ব্রজনাথকে সুস্থ করে বেশ কিছুদিন পর বাড়ি ফেরেন।

"তিনি বন্ধু সেবার জন্য কান্দী ও কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও বরিশাল, কলিকাতা ও কাশী, ঢাকা ও মেদিনীপুর সর্ব্বত্র ছুটোছুটি করিতে পারিতেন। বন্ধুজনের বিপদ্বিমোচনে ও সুখসাধনে সর্ব্বস্ব ব্যয় ও আত্মবিক্রয় করিতে পারিতেন।"

(চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩২৬)

এহেন বিদ্যাসাগরকে বন্ধুবিচ্ছেদের জন্য আজীবন দুঃখকষ্ট সইতে হয়েছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মৃত্যুতে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। ১৮৬৮ সালে বিদ্যাসাগর হারালেন রামগোপাল ঘোষ (জানুয়ারি), সারদাপ্রসাদ রায় (মার্চ), এবং পাইকপাড়ার বৃদ্ধা রানি কাত্যায়নীকে (অগস্টে)। ১৮৬৯ সালে ডিসেম্বর মাসে হারালেন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের অন্যতম সহযোদ্ধা হরচন্দ্র ঘোষকে। ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে তাঁর পরম বান্ধব ও শিক্ষক। বিদ্যাসাগর প্রিয় বন্ধুর কাছে ইংরেজি শিখেছিলেন, আবার দুর্গাচরণের চিকিৎসা-সাহায্যে ও উৎসাহে তিনি শত শত আর্তপীড়িতের প্রাণদান করতে পেরেছিলেন। ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারি

মাসে এই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুর বিয়োগে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। এই বছরেই তাঁর অন্যতম সুহৃদ ও সহায় বর্ধমানের মহারাজ মহাপ্রতাপচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

হাইকোর্টের তখনকার এক অন্যতম জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও বিদ্যাসাগর ছিলেন উভয়েই উভয়েরই সহায় ও পৃষ্ঠপোষক। বিদ্যাসাগর যেমন বহু কাজে তাঁর পরামর্শ নিতেন তেমনি দ্বারকানাথও বিদ্যাসাগরের মত না নিয়ে কোনো কঠিন বিষয়ের সমাধান করতেন না। এহেন বন্ধুর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একবার মতবিরোধ হয়। সেই বিচিত্র কাহিনীর মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা এবং আধুনিকতা প্রতিভাত হয়। ১৮৭৩ সালে কোলকাতা হাইকোর্টে একটি বিচিত্র মামলা দায়ের হয়। মামলাটির বিচার্য ছিলো, হিন্দু বিধবার চরিত্র স্বামীর মৃত্যুর পর কলঙ্কিত হলে হিন্দু শাস্ত্রমতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কিনা? এই বিষয়ে আদালতের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং ভরতচন্দ্র শিরোমণি-দের মতামত আহ্বান করা হয়। বিদ্যাসাগর ব্যতীত অপর দুই পণ্ডিত বলেন, "হিন্দুশাস্ত্রমতে কলঙ্কিত বিধবা বিষয়চ্যুত হইতে পারে।" জজ দ্বারকানাথেরও এই মত ছিলো। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন–

> "আমি কিন্তু ভ্রষ্টাচারের পক্ষপাতী নহি; কিন্তু একজন বিষয়ের অধিকারিণী হইলে, কেমন করিয়া বলিব, আবার সে বিষয়চ্যুত হইবে।"
>
> (বিহারীলাল সরকার, পৃঃ ৩৩২)

দশজন বিচারকের মধ্যে আট জনই বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন করেন। স্বভাবতই দ্বারকানাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্য হয়। সর্বোপরি সমগ্র হিন্দুসমাজ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। অনেকেই কুৎসা রটায় যে, পতিতা রমণীর বিষয়চ্যুতি আইনসিদ্ধ হলে, বিদ্যাসাগরের প্রিয় বিধবা বিবাহ আন্দোলনে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনায় তিনি বন্ধু দ্বারকানাথের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কিন্তু প্রায় দেড়শো বছর পরে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, বিদ্যাসাগর শুধু আধুনিক ছিলেন না, তিনি যুগের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। শত্রুর ভ্রুকুটিতে, মিত্রের আবেদনে বা আপন স্বার্থে বিদ্যাসাগরের কখনই কোনোরূপ পদস্খলন হয়নি। এই ঘটনার পরও দ্বারকানাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট ছিলো। ১৮৭২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বারকানাথের মৃত্যু চিরতরে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়।

মৃত্যুর কারণে বিচ্ছেদ তো অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কয়েকজন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে অন্য কারণেও বিচ্ছেদ ঘটেছিলো। এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটা ছড়া শোনা যাক।

> "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
> কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।।
> রাখাল গরুর পাল চলে যায় মাঠে।
> শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।।"

ছড়াটি আপামর বাঙালির মুখস্ত। লেখকের নাম অধিকাংশই জানেন না বা ভুলে গেছেন। কিন্তু বাঙালি সত্ত্বায় এরা মিশে গেছে। তাইতো সামসুর রহমান বিখ্যাত কবিতা, 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে'-তে লেখেন–

> "যখন সকালে নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্যশিক্ষার অক্ষর, কাননে কুসুমকলি ফোটে।"

এই চিরন্তন ছড়াটির বিস্মৃত লেখকের নাম মদনমোহন তর্কালঙ্কার। মদনমোহন ছিলেন বিদ্যাসাগরের সহপাঠী। সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণী থেকে তাদের বন্ধুত্বের শুরু, পরে সেটা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বিদ্যাসাগরের সব শুভানুষ্ঠানে মদনমোহন অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। তিনি বিদ্যাসাগরের চেয়ে বছর তিনেকের বড় ছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর স্ত্রীকে 'বৌদিদি' বলে ডাকতেন। এমন মধুর সম্পর্ক ছিলো যে বিদ্যাসাগর অম্লানবদনে

'বৌদিদির' পাশে বসে 'বৌদিদির' থালা থেকে একসাথে ভাত খেতেন। মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৪৯ সালে এবং তৃতীয় ভাগ ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো। এই 'শিশুশিক্ষা'র স্বত্বাধিকার নিয়ে বিদ্যাসাগরকে পরবর্তীকালে অনেক কুৎসার মুখোমুখি হতে হয়। তবে সেটা এখানে আলোচ্য নয়। আমাদের বিষয়-বন্ধুবিচ্ছেদ। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বাল্যবন্ধু মদনমোহন কোলকাতা বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের চাকরি পান, ১৮৪৬ সালে তাঁরই অনুরোধে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হলেন। তারপর ১৮৪৭ সালে তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, দু'জনের সমঅংশীদারিত্বে 'সংস্কৃতযন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিলো। ছাপাখানা খুব ভালোমতো চলতে লাগলো। ১৮৫০ সালে মদনমোহন সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হলেন, তারপর মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। এইসময় ছাপাখানা নিয়ে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের মনোমালিন্য শুরু হলো।

> "বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই বলিতেছেনঃ- "ক্রমে ক্রমে এরূপ কারণ উপস্থিত হইলে যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোন বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে।"

(চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪৮)

পরিণতিতে অচিরেই দু'জনেরই বন্ধু পটলডাঙ্গার শ্যামাচরণ দে এবং আরও দুই জনের মধ্যস্থতায় ছাপাখানা ভাগ হয়ে গেল। মদনমোহন নিজের প্রাপ্য বুঝে নিয়ে বিদ্যাসাগরকে পুরো ছাপাখানা ছেড়ে দিলেন। মতবিরোধের কারণগুলি বিদ্যাসাগর নিজে বা তাঁহার জীবনীকারগণ কেহই বিশদে উল্লেখ করেননি। বন্ধু বিচ্ছেদে বিদ্যাসাগরের অভিব্যক্তি জানতে না পারলেও মদনমোহন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন, যার প্রমাণ আর এক বন্ধু শ্যামচরণকে লেখা তাঁর একটি পত্র।

> "...ক্রমশ পদোন্নতি ও এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটী পদপ্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলি বিদ্যাসাগরের সহায়তা বলে হইয়াছে। অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন তবে আর আমার এই চাকরি করায় কাজ নাই, আমার এখনই ইহাতে ইস্তফা দিয়া, তাহার নিকট উপস্থিত উচিত হয়।... আমার বাল্যসহচর, একহৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক, পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ৬ মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই, আমি কেবল জীবনমৃতের ন্যায় হইয়া আছি।"

(ইন্দ্রমিত্র, পৃঃ ৫৪৫)

ছাপাখানা ভাগ হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই ১৮৫৮ সালে মদনমোহনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দনরত স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে ঈশ্বর বেঁচে থাকতে তাদের কোনো কষ্ট হবে না। সত্যিই তাই। যে বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলো, বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, জীবিতকালে তো বটেই, মৃত্যুর পরও বিদ্যাসাগর তাদের উপেক্ষা করেননি। নিজের উইলে মদনমোহনের মা বিশ্বেশ্বরী, কন্যা কুন্দমালা, এমনকী বোনের জন্যও মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করে গেছিলেন। পরবর্তীকালে কুন্দমালাকে' তাঁর বাবার 'শিশুশিক্ষা'র স্বত্ব দেওয়া নিয়ে মদনমোহনের আর এক জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন, মামলার নোটিশ পাঠান, শেষে প্রমাণাভাবে পিছিয়ে আসেন এবং বিদ্যাসাগরকে "পরস্বহারী' বলে যথেচ্ছ কুৎসা করতে থাকেন। যে কুন্দমালার জন্য যোগেন্দ্রনাথ দরবার করেছিলেন তাঁকে বিদ্যাসাগর বহু আগে থেকেই মাসিক দশ টাকা বৃত্তি দিয়ে আসছিলেন, যা এই ঘটনার পরও তিনি বন্ধ করেননি। কিন্তু কুৎসা বন্ধ হয়নি। বাধ্য হয়ে, অনেক পরে ১৮৮৮ সালে বিদ্যাসাগর যোগেন্দ্রনাথের কুৎসার জবাবে সত্য ঘটনা বিবৃত করে 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' পুস্তিকাটি প্রকাশ করলেন।

বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছ থেকে। বিদ্যাসাগরের সুপারিশ এবং চেষ্টায় ১৮৪৫ সালে তাঁর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের চাকরি হয়। মার্শাল সাহেব নব্বই টাকা মাইনের এই চাকরিটা প্রথমে বিদ্যাসাগরকেই নিতে বলেছিলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি করতেন। তবুও তিনি তারানাথের জন্য চেষ্টা করে মার্শালকে রাজি করান। তখন তারানাথ অম্বিকা-কালনায় থাকতেন। চিঠি লিখলে পাছে দেরি হয়ে যায়, তাই তিনি সারারাত হেঁটে কালনায় তারানাথের বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে পরের দিনই কোলকাতায় ফিরে আসেন। বিদ্যাসাগরের জন্যই তারানাথের যাবতীয় মান-সম্ভ্রম খ্যাতি-প্রতিপত্তি। প্রথমদিকে তারানাথ বিদ্যাসাগরকে অনুজের ন্যায় স্নেহ করতেন, অপরের কাছে ভূয়সী প্রশংসা করতেন। ১৮৪৭ সালে যখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকে ইস্তফা দেন, তখন তারানাথ আরও বারোজন অধ্যাপকের সঙ্গে মিলিতভাবে ইস্তফা গ্রহণ না করার জন্য আবেদন করেছিলেন। হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তারানাথের বিবাদ শুরু হয়, ক্রমশ তাহা চরমরূপ ধারণ করে। ১৮৫৫ সালে প্রথমবার এবং ১৮৬৬ সালে দ্বিতীয়বার বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রদ করার জন্য ইংরেজ সরকারকে চিঠি পাঠান। অবশেষে ১৮৭১ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক বিচার' প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারানাথ তর্কবাচস্পতিসহ আরো কয়েকজন এর প্রতিবাদ করেন, তারানাথ সংস্কৃত ভাষায় একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর ১৮৭২ সালে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। তারানাথ বিদ্যাসাগরকে বহুবিবাহ নিয়ে আবারও আক্রমণ করলেন। এরপর বিদ্যাসাগর 'অতি অল্প হইল' ও 'আবার অতি অল্প হইল' নামক বেনামী রচনায় তারানাথকে অহঙ্কারী, পণ্ডিতমূর্খ, বুদ্ধিশুদ্ধিহীন, অতি অপদার্থ, অতি অর্বাচীন, বেহুদা পণ্ডিত, গায়ে মানুষের চামড়া নাই– এইরূপে বহু কটূক্তি করেছেন। দু'জনের মধ্যে যে মনোমালিন্য হয়েছিলো তা আর কোনোদিন দূর হয়নি।

রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিলো। কিন্তু বিধবা বিবাহ উপলক্ষে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে। আন্দোলনের সময় রামপ্রসাদ রায়ের কাছ থেকে অনেক সহানুভূতি পেয়েছিলেন। কিন্তু কার্যকালে, অর্থাৎ প্রথম বিধবা বিবাহের (শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন) সময় তিনি পিছিয়ে গেছিলেন।

> "শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহের পূর্বে বিদ্যাসাগর সাক্ষরকারীগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রামপ্রসাদ রায় বলিলেন, 'আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিবো, বিবাহস্থলে নাই গেলাম?' এই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইলো না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,- 'ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।' এরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।"
>
> (বিহারীলাল সরকার, পৃ: ২৩০-২৩১)

শুধু রামপ্রসাদ নন আরো অনেক বন্ধুই বিধবা বিবাহ আন্দোলনের শুরুতে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে এক এক করে অদৃশ্য হয়ে যান। ফলে সমূহ ব্যয়ভার (মহাসমারোহে প্রতিটি বিবাহ দেওয়া হতো) বিদ্যাসাগরেরই উপরে এসে পড়লো। অনেকেই ধারের টাকা অবিলম্বে শোধ করার জন্য তাগাদা শুরু করলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনিও বিধবা বিবাহের জন্য যে টাকা ধার দিয়েছিলেন তা ফেরৎ চেয়ে পাঠালেন। এই সময় বিদ্যাসাগর পরমে বন্ধু মধুসূদন স্মৃতিরত্নকে রসিকতা করে বলেছিলেন–

"অনেক লোকে মিলেমিশে একাজে (বিধবাবিবাহ) হাত দিয়াছিলাম, কিন্তু যারা মায়ের ব্যাটা, তারা চুপে চুপে ঘরে গেল, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে গেল আর আমি বাপের ব্যাটা, কাজে কাজেই ধরা পড়লাম।"

(চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯৭)

ক্রমে তিনি প্রকৃত অর্থে সর্বস্বান্ত হলেন এবং ঋণজালে জড়িয়ে পড়লেন। এতদূর বিপন্ন হয়েছিলেন যে নিরুপায় হয়ে তখনকার ছোট লাট সিসিল বিডনের কাছে সরকারি চাকরিতে আবার যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছলেন। অবশ্য সেটা হয়নি। তবে ধারের টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বন্ধুদের আর ফিরে পাননি।

আবার অভিমানেও কিছু বন্ধু বিচ্ছেদ হয়েছিলো। এক্ষেত্রে দুটি নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মহেন্দ্রলাল ছিলেন বিশিষ্ট বন্ধু। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের জন্যই তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আগ্রহী হন এবং প্রচুর নাম করেন। আবার মহেন্দ্রলালের ভারত বিজ্ঞান সভা (কালটিভিশন অব সায়েন্স) প্রতিষ্ঠাকালে তিনি এক হাজার টাকা দান করেছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যার অসুখের সময় বিদ্যাসাগরের চিঠি পেয়েও মহেন্দ্রলাল আসেননি। আসলে তিনি চিঠি না পড়েই রেখে দিয়েছিলেন। পরে যখন আসেন, বিদ্যাসাগর দেরির কারণ জেনে খুব রেগে যান। উভয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু শয্যায় আবার উভয়ের মিলন হয়।

বিদ্যাসাগর মাইকেলকে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। অন্যের থেকে ধার করে তাঁকে সাহায্য করতেন। আবার মাইকেলের কাছে ঈশ্বরের পরেই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের স্থান।

"My trust is in God and after God in you".

লন্ডন থেকে মাইকেলের চিঠি, ২৫/০২/১৮৬৬

কিন্তু-

"মৃত্যুর দুই-এক বৎসর পূর্ব হইতে মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়স্থল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। তিনি নিজের স্বভাবের দোষাতিরেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিষ্ণুতার সীমা মধ্যে স্থির থাকিতে পারেন নাই। মাইকেল শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আদৌ সদ্ব্যবহার করেন নাই। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় মাইকেলকে 'বাবু' সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। মাইকেল সে পত্র প্রত্যাখান করেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাতফেরত বাঙ্গালীদিগকে বড় গ্রাহ্য করিতেন না।"

(বিহারীলাল সরকার, পৃঃ ২৩৭)

কিন্তু এটা ছিলো সাময়িক। মাইকেলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ছিলো চিরন্তন। মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে মাইকেলের সমাধিস্থানের উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য যখন চণ্ডীচরণ প্রমুখরা বিদ্যাসাগরের কাছে চাঁদার জন্য যান, তখন:–

"তিনি বহু আলাপ ও বিলাপের পর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন, 'দেখ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাহার জান রাখিতে পারি নাই, তাহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।"

(চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৪৮)

শেষ কয়টি বছর নানা অসুখে তিনি প্রচুর কষ্ট পেয়েছিলেন, কাবু হননি। কিন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পরম মিত্রজনের মৃত্যু তাঁর মন ভেঙে দিয়েছিলো। প্রাণপ্রতিম বন্ধু প্যারীচরণ সরকার, শ্যামচরণ বিশ্বাস, প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখের বিয়োগ তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। আগেই চলে গেছেন প্রাণাধিক প্রিয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। আর কত সহ্য হয়। শোকতাপ-পীড়িত, ব্যাধিজর্জরিত ঈশ্বর ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই কোলকাতায় চিরবিদায় নিলেন।

তথ্যঋণ :-

(১) 'বিদ্যাসাগর', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকৃতি। ২০২০
(২) 'বিদ্যাসাগর', বিহারীলাল সরকার, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ১৯৮৬
(৩) 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', ইন্দ্র মিত্র, আনন্দ। ২০১

বেথুন বৃদ্ধাশ্রম স্থাপনের সম্ভাব্যতা

গৌতম রায়চৌধুরী

গত ৯ তারিখ, বুধবার অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির সভায়, প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোডস্থ বেথুন ক্লিনিকের প্রথম এবং দ্বিতীয় তলায় বৃদ্ধাশ্রম স্থাপনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে, যখন যৌথ পরিবার-প্রথা নিশ্চিহ্ন প্রায় এবং অর্থনৈতিক কারণে ছেলে-মেয়েরা চাকরি সূত্রে অন্যত্র বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন, প্রবীণদের জন্য বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ২০১৭ সালে প্রস্তাবিত অর্থোপেডিক হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তাই সর্বাগ্রে এই সন্দেহের নিরসন হওয়া আবশ্যক।

২০১৭ সালে আমরা জানিয়েছিলাম যে আমাদের মূল লক্ষ্য একটি অর্থোপেডিক হাসপাতাল স্থাপন। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব নয় বলে আমরা লক্ষ্যটাকে ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলাম। প্রথম এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিলো যথাক্রমে চিকিৎসা কেন্দ্র ও একটি আধুনিক ফিজিওথেরাপি কেন্দ্র গড়ে তোলা। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেই আমরা দান সংগ্রহ করেছিলাম। অতীব আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে, উল্লিখিত দুটি লক্ষ্যই পূরণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে যে ফিজিওথেরাপি কেন্দ্রটি রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত হাসপাতালের সম্পাদক মহারাজ উদ্বোধন করেন, তা আজও জনগণের সেবা করে চলেছে। পরবর্তীকালে আমরা ডাক্তারি পরিষেবা কেন্দ্র ছাড়া আকুপাংচার ও ডেন্টাল ক্লিনিক চালু করতে পেরেছি। এই কাজের জন্য আমরা ২০১৭ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৪১২ জন দাতার কাছ থেকে মোট ৪,০০৮৩৫ টাকা দান হিসেবে সংগ্রহ করেছি। উক্ত সময় কালে আমাদের ব্যয় হয়েছে মোট ৩,৯৬৮২৭ টাকা। অতিরিক্ত ৪,০০৮ টাকা আমাদের ব্যাংকে গচ্ছিত আছে। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিলো একটি এক্সরে মেশিন বসানো। তার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও কর্পোরেটের থেকে দান সংগ্রহের চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায়নি। এখানে উল্লেখ্য যে এক্সরে মেশিনের জন্য কোনো ব্যক্তিগত দান সংগ্রহ করা হয়নি। করোনা অতিমারিকালে, ২০২১ সালে অক্সিজেন পার্লার স্থাপনের জন্য ব্যক্তিগত দান সংগ্রহ করা হয় এবং চারটি সিলিন্ডার দিয়ে পরিষেবা শুরু করা হয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা ২০২১ সালে ১৫ জন দাতার কাছ থেকে ১,০০২৫০ টাকা সংগ্রহ করেছিলাম এবং ৫৫,৮০০ টাকা ব্যয় করেছি। অতিরিক্ত ৪৪,৪৫০ টাকা আমরা ব্যাংকে জমা রেখেছি পরবর্তীকালে এই পরিষেবা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে আমরা কখনোই ব্যর্থ হইনি। প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হয়েছে।

অর্থোপেডিক হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার আরও দুটি কারণ আছে। প্রথমত, এই কাজে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা আমাদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, বেথুন ক্লিনিকের খুব নিকটেই আছে বাঙ্গুর সরকারি হাসপাতাল। ফলে আমাদের হাসপাতলে রোগী পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

Vol : XV Issue : VII, 15th October, 2025. PRABINBARTA Postal Regd. No.- KOL RMS/449/2025-27

উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য, আমরা চিকিৎসাকেন্দ্র এবং ফিজিওথেরাপি সেন্টারের পরিষেবা অক্ষুন্ন রেখে বাকি ফাঁকা জায়গায় একটি বৃদ্ধাশ্রম করে তোলার সিদ্ধান্ত প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করেছি। এই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন, গৌতম রায়চৌধুরী (আহ্বায়ক), পেলব মুখার্জি (পদাধিকারবলে), মৃণাল দত্ত, নিখিলেশ মিত্র, নারায়ণ দাস, অনুপ রায়, সিক্তা দাস, অশোক রঞ্জন ধর, স্নেহাংশু চাকদার, শরদিন্দু মুখার্জি এবং প্রসেনজিৎ দে। এই কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে গভর্নিং বডি কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কাজ করবে। এই নীতিগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১) সরকারের নির্ধারিত নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করতে হবে। কোনোরূপ আপোস করা যাবে না।

২) বেথুনের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র বাড়িটা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। অন্য কোনো আর্থিক সাহায্য করা সম্ভব হবে না।

৩) বৃদ্ধাশ্রম 'না মুনাফা না ক্ষতি'-নীতিতে চলবে।

৪) প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা বৃদ্ধাশ্রম পরিচালিত হবে।

গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে কমিটিকে আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।

"যেখানে সমস্যা সেখানে প্রয়োজন সমাধান
দুর্ভাবনা নয়।
যেখানে করণীয় সেখানে প্রয়োজন কাজ
দুশ্চিন্তা নয়।
উপায় অনুসন্ধানের জন্য চিন্তা
দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করার জন্য নয়।"

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস স্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) -মঙ্গলবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Tapan Kumar Das on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph.: 9830933834 / 9674553477 and Printed at Monalisa Printers, D/26 Katjurnagar, Kolkata- 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata- 700 045, Editor- Tapan Kumar Das.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in